OPEN ACCESS **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 80 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 80 - 86
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দ্বৈতবাদ

শঙ্কর মণ্ডল
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া
Email ID : sankar3.sm@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
Madhvacharya, Dualism, Non-Dualism, Brahman, Upanishads, Leelavada, Rasa, Bhakti.

Abstract
Acharya Madhvacharya was the main proponent of dualism. The poet Rabindranath Tagore was deeply influenced by dualism. But his dualism is distinct from the dualism of Madhvacharya. Rabindranath was a lilavadi. He wanted to perceive the form, taste, sound, smell, touch of this world with the five senses as divine bliss. Rabindranath did not abandon this world as false illusion. This world is to him exclusively true and the manifestation of God. So, he could not accept the Advaitism or Mayavada introduced by Shankaracharya. Because in pure Advaita, Lila (divine play) is distant, and no action is possible there. Thus, he was influenced by dualism. Rabindranath possessed both a strong intellect and a deep heart, along with a burning desire to serve God. He sought to attain God through the simultaneous engagement of mind, heart, and action. Rabindranath's desire was not satisfied in pure Advaita. Rabindranath's desire would not have been fulfilled had he followed non-dualism. Even though Nirguna, formless Supreme Brahman is known by knowledge, but love and devotion cannot be established with him. So, Rabindranath is inevitably attracted to duality.

Rabindranath was drawn to dualism for personal and spiritual reasons. He realized that a profound joy operates at the root of the entire universe. From this supreme bliss all beings are born, within this bliss all beings live, and after death all beings return to this bliss. Therefore, the creator of the world should not be known merely through intellect but through a relationship of joyful love. Otherwise, the purpose of creation would be unfulfilled, realizing that the ultimate purpose of creation is the enjoyment of bliss. Rabindranath was influenced by this concept of bliss in the Upanishads. Rabindranath was influenced by dualism through this concept of rasa (aesthetic experience) and ananda (bliss). For the pure 'One' cannot experience rasa; a second entity is required. The union of these 'two' results in eternal bliss. Thus, Rabindranath recognized the importance of duality. Formless, tasteless, and unmanifest unity is antithetical to Rabindranath's thinking. Although Rabindranath accepted dualism, but he did not reject non-dualism. Duality is necessary to fully realize non-duality. Thus, we see that Rabindranath's poetry begins with dualism but gradually merges into the ocean of non-dualism.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 80 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

I have tried to show in this essay how Rabindranath's poetry is influenced by dualism.

Discussion

আচার্য মধ্বাচার্য প্রবর্তিত দ্বৈতবাদের মূলকথা হল-ঈশ্বর, জীব এবং জগৎ একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। ঈশ্বর হলেন জগতের নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতি হল জগতের উপাদান কারণ। মধ্বাচার্যের মতে ঈশ্বর প্রকৃতি থেকে এই জীব জগতের সৃষ্টি করেছেন এবং ঈশ্বর ও জীবজগতের মধ্যে ভেদ কখনো অতিক্রম করা যায় না। দ্বৈতবাদের এই প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখে যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলোকে দেখি, তাহলে দেখব তিনি মধ্বাচার্য প্রবর্তিত দ্বৈতবাদকে অনুসরণ করেননি। যদিও তাঁর কবিতায় দ্বৈতবাদের ছায়া আছে। যেখানে তিনি ঈশ্বর থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখেছেন। রবীন্দ্রমানস মূলত দ্বৈতবাদী। যদিও তাঁর দ্বৈতবাদ প্রথাগত দ্বৈতবাদ থেকে স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লীলাবাদী। সেই জন্য বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিশুদ্ধ অদ্বৈতে লীলা তো দূরের কথা, সেখানে কোনরূপ ক্রিয়াই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই দ্বৈতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল ছিল, তেমনি হৃদয়বৃত্তিও শক্তিমান ছিল। সেই সঙ্গে ছিল সেবা করার আকুল বাসনা। তাই তিনি ঈশ্বরকে যুগপৎ মন, হৃদয় ও কর্ম দিয়ে পেতে চেয়েছিলেন। অদ্বৈতবাদকে অনুসরণ করলে রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা পূর্ণ হতো না। কারণ, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মকে জ্ঞানের দ্বারা জানা গেলেও, তাঁর সঙ্গে প্রেম ও সেবার সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথকে অনিবার্যভাবে দ্বৈততার আশ্রয় নিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতবাদী হওয়ার পিছনে শুধু ব্যক্তিগত কারণ ছিল না, একটি আত্মাধ্যাত্মিক কারণও ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মূলে এক আনন্দ ক্রিয়াশীল। এই আনন্দ থেকেই জীবসকলের সৃষ্টি। এই আনন্দের মধ্যেই জীবসকল জীবনধারণ করেন। আবার মৃত্যুর পর এই আনন্দতেই প্রত্যাগমন করেন। তাই বিশ্বস্রষ্টাকে কেবল বুদ্ধি দিয়ে জানলে হবে না, তাঁর সঙ্গে আনন্দময় প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তা না হলে এই বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। 'তৈত্তিরীয় উপনিষদে' ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
এষ-হ্যেবানন্দয়াতি।
(তৈত্তিরীয় উপনিষদ- ২/৭)

এই রসের আকর্ষণেই বিশ্বসত্তা বিশ্বশিল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন। সমগ্র সৃষ্টি যদি রূপহীন, রসহীন ও আনন্দহীন হতো তাহলে কেউ আর জীবনধারণ করতে চাইত না। উপনিষদের এই আনন্দবাদকে রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন সৃষ্টির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই হল আনন্দ আস্বাদন করা। এই রস ও আনন্দের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ দ্বৈতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কারণ, বিশুদ্ধ 'একে'র পক্ষে রস অনুভব করা সম্ভব নয়, তার জন্য দ্বিতীয় সত্তার প্রয়োজন। এই 'দুই'এর মিলনের ফলেই অনন্ত আনন্দধারা প্রবাহিত হয়। বেদে বলা হয়েছে, সৃষ্টির পূর্বে আদিতে ব্রহ্ম একা ছিলেন। একা থাকার ফলে কিছুতেই তিনি নিজের আনন্দময় রসস্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। তাই আনন্দের জন্য সেই আদি একক সত্তা নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করলেন। তাঁর এই প্রকাশের ফলে বিশ্বে আনন্দধারা ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্বসত্তার আপন মাধুর্য আপনার চোখে ধরা পড়ল। ব্রহ্মের এই মূর্ত প্রকাশকে উপনিষদের ঋষিরা আনন্দরূপম্ বলে অভিবাদন জানালেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও উপনিষদের এই সৃষ্টিতত্ত্ব ধরা পড়েছে—

"যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুইয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা।"[১]

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ দ্বৈততার গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। রূপহীন, রসহীন, প্রকাশহীন একত্ব রবীন্দ্র-মনন বিরোধী। তিনি হলেন আস্বাদনপন্থী। নির্গুণ নিরাকার একত্বের মধ্যে কোনোভাবে লীলা সম্ভব নয়। তাই তিনি অনিবার্যভাবে দ্বৈততার আশ্রয় নিয়েছেন। অবশ্য তাঁর দ্বৈততা অদ্বৈতের বিরোধী নয়; বরং অদ্বৈতকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে গেলে দ্বৈততার প্রয়োজন। অদ্বিতীয় একের পক্ষে নিজেকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সেইজন্য প্রথমেই দ্বৈততার আভাস এবং তার পরেই অদ্বৈতচেতনা। রবীন্দ্রনাথ তাই 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'পরিণয়' কবিতায় বলেছেন—

"একার ভিতরে একের দেখা না পাই
দুজনার যোগে পরম একের ঠাই—"[২]

এই দ্বৈততার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ মানুষের অহংকারকে ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের অহংকার ব্যতীত এই দ্বৈতবোধ সম্ভব নয়। ছবি শূন্যে আঁকা যায় না, তার জন্য ক্যানভাস চাই। তেমনি সৃষ্টির সৌন্দর্য ও আনন্দের সার্থকতা মানবচেতনায়। তাঁর কাছে যেমন মানবমন ব্যতীত ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, তেমনি মানবমন ব্যতীত বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্পও নিরর্থক। মানুষের অস্তিত্ব যেমন ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, তেমনি ঈশ্বরের অস্তিত্বও মানুষের উপর নির্ভরশীল। মানুষ না হলে সেই বিশ্বদেবতার মহামন্দিরে শঙ্খধ্বনি বাজত না। অরূপের বাণী চিরকাল অশ্রুতই থেকে যেত। কবি তাই 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'আমি' কবিতায় সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে গর্ব করেছেন—

"এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'আমি' কবিতায় স্বীকার করে নিয়েছেন, মানুষের অহংকার আছে বলে দ্বৈতবোধ আছে। যেদিন মানুষ থাকবে না, মানুষের অহংকার থাকবে না, সেদিন সব এক ও অদ্বৈতে লীন হয়ে যাবে। তবে এই অদ্বৈত অবস্থাই একমাত্র সত্য নয়। এই রূপময় পৃথিবীও একান্তভাবে সত্য। তত্ত্বজ্ঞানী মায়াবাদী মানুষেরা 'নেতি নেতি' করে জগতের অস্তিত্বকে যতই অস্বীকার করুক না কেন, জগতের সত্যমূল্য আছে। কারণ, স্বয়ং ভগবান আত্মপ্রকাশের জন্য মানুষের সীমানায় সাধনা করছেন। তাই কবির বিশ্বাস যেদিন মহাপ্রলয়ের অন্ধকারে সমগ্র সৃষ্টি ডুবে যাবে, সেদিন ব্যক্তিত্বহারা ঈশ্বর আবার সাধনায় বসবেন নতুনভাবে সৃষ্টি করার জন্য। কারণ, এই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেন। এই সৃষ্টি ছাড়া তাঁর অস্তিত্ব অনস্তিত্বের সামিল। গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে কবি এখানে অদ্বৈতবাদের মায়াবাদী সৃষ্টিতত্ত্বকে অস্বীকার করে জগতের সত্যমূল্য দিয়েছেন; যা দ্বৈতমানস প্রসূত। এই দ্বৈততাবোধ থেকেই কবি ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। যেখানে তিনি ভক্তকে ছোটো করে দেখেননি। বরং ভক্তের অহংকার তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ, তিনি জানেন মানুষ যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে চায়, তেমনি ঈশ্বরও মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে চান। মানুষ আকুলিবিকুলি করে ডাকবে এবং ঈশ্বর দয়া করে সাড়া দেবেন-এটা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের শেষ কথা নয়। আরও একটি গোপনতর কথা আছে। আমি যেমন তাঁকে চাই, তেমনি তিনিও আমাকে চান। শুধু তিনিই আমার প্রিয়তম নন, আমিও তাঁর প্রিয়তম। সংহিতা বলছেন, দেবতাও উতলা, অধীর, কাঙাল আমাদের জন্যে। কবি তাই বলছেন—

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর,
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"[৪]

এভাবেই রবীন্দ্রনাথ দ্বৈতভাবের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। মানুষের সৃষ্টি না হলে এই মহান শিল্পীর শিল্পকর্ম অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। মানুষ হিসেবে তাই তিনি গর্ববোধ করেন। মানবমনের অনুভূতিতে সৃষ্টির আনন্দ ও মাধুর্য ধরা না পড়লে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। তবে রবীন্দ্রনাথ কথিত দ্বৈতবাদের সঙ্গে মধ্বাচার্য কথিত দ্বৈতবাদের মিল নেই। দ্বৈতবাদীর

মতো তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বরের নির্দিষ্ট রূপমূর্তি কল্পনা করেননি। জগতের আনন্দযজ্ঞে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি কেবল দ্বৈতভাবটুকু গ্রহণ করেছেন। পারিবারিক ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ঈশ্বরকে পিতারূপে কল্পনা করেন। এই পর্বে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, সেব্য-সেবকের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ঈশ্বর সেখানে এক ঐশ্বর্যবান বিরাট পুরুষ, সমস্ত শক্তির উৎস। এই পর্বে কবির সঙ্গে ঈশ্বরের প্রীতি বা সাম্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথ এখানে অত্যন্ত ন্যূন। ভক্তি, প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনের সুর এই পর্বে প্রধান্য লাভ করেছে। কবির 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে এই সুর ধরা পড়েছে। 'নৈবেদ্যে' কবির ভগবান বিরাট, অনন্ত, ঐশ্বর্যময়। তিনি পিতা, প্রভু ও পরমেশ্বর। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের সকল কবিতাই প্রার্থনামূলক। প্রতিদিনের সংসারের বিচিত্র কর্ম-কোলাহলের মধ্যে কবি জীবনস্বামীর সম্মুখে দাঁড়াতে চাইছেন। সর্বদা দেহ-মনে জীবনস্বামীকে কামনা করছেন। তাঁর চরণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে চাইছেন। আর বারবার প্রার্থনা করছেন যাতে ঈশ্বরের প্রতি নিবিড় প্রেমে তাঁর হৃদয় ভরে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হয়েছে। এই পর্বে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান রয়ে গেছে। ঈশ্বরকে পিতা ভাবার মধ্যে প্রীতি থাকলেও সাম্য নেই, বাৎসল্য থাকলেও মাধুর্য নেই। ঈশ্বর এখানে উপাস্য এবং কবি উপাসক। ঈশ্বর বড় এবং কবি ছোট। ঈশ্বর প্রভু এবং কবি তাঁর অনুগত দাস। ঈশ্বরের সঙ্গে সাধকের এই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক দ্বৈতমানস প্রসূত। দ্বৈতবাদী সাধকেরা এতেই বেশি তৃপ্তিবোধ করেন। কিন্তু সাম্যবাদী রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের এই ঐশ্বর্যময় রূপের মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাননি। তাই বাৎসল্য থেকে তাঁর মন ধীরে ধীরে মধুরের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে—

"দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে দু হাত ধরি নে।"[৫]

এরপর 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' এবং 'গীতালি'তে ভগবান তাঁর বিরাট ঐশ্বর্যময় রূপ পরিত্যাগ করে লীলাময় হয়ে দেখা দিয়েছেন। ঐশ্বর্যময় প্রভু এখন লীলাময় প্রেমিক। আবার কখনো তিনি রাজা, কখনো বা ভিখারি। 'খেয়া'র 'গোধুলিলগ্ন' কবিতায় কবি বধূবেশে সজ্জিত হয়েছেন, বাসর-শয্যার জন্য পুষ্পসম্ভার ও দীপ সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রিয়তমের সঙ্গে প্রথম মিলনে কবির মনে উৎকণ্ঠা ও সংশয় দেখা দিয়েছে। 'খেয়া'র 'মুক্তিপাশ' কবিতায় কবি অজানিতে প্রিয়তমের স্পর্শ লাভ করেছেন।

দ্বৈতবাদীরা মনে করেন ভগবানের কৃপা ব্যতীত সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই মুক্তিলাভের জন্য কিংবা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কৃপা একান্ত আবশ্যক। এই কৃপাবাদ সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের মর্মকথা। উপনিষদেও এর আভাস আছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন প্রবল পুরুষকার থাকলেও ঈশ্বরের কৃপা নাও হতে পারে। ভাবগ্রাহী জনার্দন; একমাত্র ঈশ্বরই পারেন জীবের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে। তাঁর কৃপায় সবকিছু সহজ-সরল হয়ে যায়। বৈষ্ণব সাধকেরা প্রথম থেকেই ঈশ্বরের এই কৃপার ভিখারি। খ্রিস্টীয় ধর্মেও এর প্রাধান্য আছে। রবীন্দ্রনাথও তেমনি বলেছেন, মানুষের শত পুরুষকার যেখানে ব্যর্থ, ভগবান কেবল চোখ মেলে তাকালেই সবকিছু সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ও 'খেয়া'র 'ফুল ফোটানো' কবিতায় আধ্যাত্মিকতার বিকাশের জন্য এই কৃপাবাদের কথা বলেছেন।

"তোরা কেউ পারবি নে গো,
পারবি নে ফুল ফোটাতে।
যতই বলিস, যতই করিস,
যতই তারে তুলে ধরিস,
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
আঘাত করিস বোঁটাতে—"[৬]

তবে শুধু মানুষ নয়, ভগবানও ভিখারী সেজে মানুষের দ্বারে আসেন। তিনি মানুষের প্রেমের ভিখারি। তিনি চান মানুষ তাঁর সর্বস্ব সমর্পণ করুক তাঁর চরণে। এই মহাদানের মূল্যরূপে ভগবান পূর্ণরূপে ধরা দেবেন ভক্তের কাছে। চরম ত্যাগের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 80 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্বারাই পরম বস্তু লাভ হবে। ত্যাগের পথে, দুঃখের পথে এবং চরম আত্মবিলোপের পথে আসবে ঈশ্বরের স্পর্শ। রবীন্দ্রনাথের 'কৃপণ' কবিতায় এই তত্ত্ব ধরা পড়েছে—

"দিলেম যে রাজ-ভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে,
তোমায় কেন দিইনি আমার
সকল শূন্য করে।"[৭]

'বালিকা-বধূ' কবিতায় কবি তাঁর বিরাট, মহান স্বামীর সঙ্গে বালিকা বধূর বুদ্ধিহীন সরলতা নিয়ে মিলিত হতে চেয়েছেন। বৈষ্ণব সাধকদের মতো তিনি এখানে ঈশ্বরকে স্বামীরূপে কল্পনা করেছেন। বৈষ্ণব সাধকেরা অনুভব করেন, একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, আর জীবমাত্রই তাঁর প্রণয়িনী। সেই কল্পনায় পূর্ণ মধুর রসের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-কল্পনায় ঈশ্বর এখানে শক্তিমান ও ঐশ্বর্যবান স্বামী হিসেবে ধরা দিয়েছেন। তবে মধুর কিংবা ঐশ্বর্যরূপেই নয় রুদ্র রূপেও রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বর ধরা দিয়েছেন। ভগবানের স্পর্শ পেতে হলে কঠিন ত্যাগ ও পরম দুঃখের পথে যেতে হবে। সোনা যেমন পুড়ে পুড়ে খাঁটি হয়, তেমনি দুঃখ ও অশান্তির আগুনে পুড়ে হৃদয়ের সমস্ত ময়লাকে দূর করতে হবে। 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' হল রবীন্দ্রকাব্যে রসলীলার যুগ। 'গীতাঞ্জলি'তে কবি পরম রসময়কে পাবার জন্য এবং তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। এই পর্বে রবীন্দ্র-চেতনায় বৈষ্ণবীয় লীলাবাদের প্রভাব পড়েছে। তবে বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ এবং রাবীন্দ্রিক লীলাবাদ এক নয়। বৈষ্ণবীয় লীলাবাদের মূলে একটি নির্দিষ্ট ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি আছে। কিন্তু রাবীন্দ্রিক লীলাবাদে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি নেই। বৈষ্ণবরা ভগবানকে পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে ও প্রিয়তমরূপে উপাসনা করেছেন। তাঁদের সাধনায় মধুর রসই প্রধান। বৈষ্ণব পদাবলীতে দুটি ধারা সমানভাবে প্রবাহিত হয়েছে, বাইরের মানবীয় ধারা এবং ভেতরের রূপক বা তত্ত্বের ধারা। বাইরের ধারায় নির্ভেজাল মানব-রসের অভিব্যক্তি ঘটলেও বৈষ্ণব কবিদের মূল লক্ষ্য তত্ত্বের দিকে। মধুর সাধনার চরম প্রকাশ হিসেবে ভগবান তাঁদের কাছে একেবারে মানুষ প্রেমিক। পদাবলীর মতো রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে মানবীয় ভগবানে পরিণত করেননি। এমনকি তাঁর ঈশ্বর কেবলমাত্র মধুর নয়, ঐশ্বর্যরূপেও তিনি দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভগবান কখনো অসীম, কখনো রুদ্র, কখনো নটরাজ, কখনো প্রিয়তম, কখনো সর্বহারা দরিদ্র, কখনো বা চিরচঞ্চল অনন্ত লীলারসিক। রবীন্দ্রনাথ মূর্তি-নিরপেক্ষ, সাধনরীতি নিরপেক্ষ বৈষ্ণবীয় লীলাবাদের মূল তত্ত্বটুকু গ্রহণ করেছেন। তবে 'নৈবেদ্যে'র ঐশ্বর্যময় ভগবান এবং 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', ও 'গীতিমাল্য'র লীলারসিক ভগবানের মধ্যে দ্বৈতচেতনা বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অনন্ত প্রেমময় ভগবানের সঙ্গে একেবারে মিশে যাওয়ার মধ্যে সার্থকতা দেখতে পাননি। তিনি নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই মানস-চেতনার মধ্যে দ্বৈততা নিহিত। তবে দ্বৈতবাদের যে মূল কথা ঈশ্বর এবং জীব আলাদা এই তত্ত্বটুকুই তিনি গ্রহণ করেছেন মাত্র। দ্বৈতবাদীরা বলেন ঈশ্বর ও জীবের ভেদ অনন্তকালের, তাঁরা কখনো সম্পূর্ণরূপে মিলতে পারে না; রবীন্দ্রনাথ অবশ্য একথা বলেননি। তবে তিনি ব্যক্তি-সত্তার নাশ ঘটিয়ে আত্মবিলোপের পথেও হাঁটেননি। বৈদান্তিকের অভেদ জ্ঞান নয়, লীলারস আস্বাদন করার জন্য তিনি আমিত্বের নির্মল অহংকারটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন। যাতে তিনি অনন্তকাল ধরে নব নব রূপে, নব নব রসে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পান। প্রকৃত মিলন অপেক্ষা মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই তিনি অনন্তকাল ধরে পথ চলতে চান—

"পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারই কণ্ঠে তোমারই গান গাওয়া।"[৮]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 80 - 86
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'গীতাঞ্জলি'র প্রথম ধারার কবিতার মধ্যে ভগবানকে না পাওয়ার জন্য তীব্র হতাশা এবং বিরহবোধ আছে। কবি এক ঝড়ের রাতে 'পরানসখা বন্ধুর' সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। ঘুমহীন বিনিদ্র রাতে তিনি বারবার দুয়ার খুলে দেখছেন; প্রিয়তম এল কিনা। কিন্তু বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কবি ভাবছেন তাঁর 'পরানসখা বন্ধু' যেন গভীর অন্ধকারে কোন এক বনের ধারে নদী পার হচ্ছেন। আশঙ্কা, অতৃপ্তি ও দোলাচলতায় কবির মন ভেঙে পড়েছে। কবি বলছেন—

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার।"[৯]

'গীতাঞ্জলি'র দ্বিতীয় ধারার কবিতায় কবির আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস আছে। অহংকার, আত্মপ্রচার এবং স্বার্থ পরিত্যাগ করে কবি আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে চান। যেমন, 'আমার মাথা নত করে দাও', 'বিপদে মোরে রক্ষা করো', 'অন্তর মম বিকশিত করো', 'এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে', 'ছিন্ন করে লও হে মোরে' প্রভৃতি কবিতায় কবি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন। কবি বলছেন তাঁর মধ্যে ভোগবাসনা প্রবল। করুণাময় ঈশ্বর বারবার আঘাত করে তাঁকে ভোগের জীবন থেকে বাঁচিয়ে ত্যাগের পথে পরিচালিত করছেন। তাই ঈশ্বরকে কঠোর মনে হলেও তিনি অনন্ত করুণাময়। ভক্তকে তিনি আঘাত করে আধা-ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচিয়ে মহাদানের যোগ্য করে তুলছেন—

"এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরই যোগ্য করে
আধা-ইচ্ছার সংকট হতে
বাঁচায়ে মোরে।"[১০]

'গীতাঞ্জলি'র তৃতীয় ধারার কবিতায় কবি ঈশ্বরের ক্ষণস্পর্শ লাভ করেছেন। এবং 'গীতাঞ্জলি'র চতুর্থ ধারার কবিতায় সীমা ও অসীমের লীলাতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই সীমা-অসীমের লীলার মধ্যে দ্বৈত অপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়।

এরপর 'গীতিমাল্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে দেখি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতি অনেকটা পরিণত হয়েছে। 'গীতাঞ্জলি'তে কবি-হৃদয়ের অনন্ত বিরহ 'গীতিমাল্যে' মধুর বিরহ-বেদনায় পরিবর্তিত হয়েছে। দুঃখের অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে তিনি সান্ত্বনার তটভূমি দেখতে পেয়েছেন। কবি বুঝতে পেরেছেন তাঁর প্রিয়তম তাঁকে কাঁদাচ্ছেন বটে কিন্তু এই কাঁদার পরমমূল্য তিনি একদিন পাবেন। 'গীতাঞ্জলি'র আকুল বিরহ-কান্না ও 'গীতিমাল্যে'র মধুর বিরহ-বেদনার পর 'গীতালি'তে কবি প্রিয়তম ঈশ্বরকে পূর্ণরূপে কাছে পেয়েছেন। ঈশ্বরের কাছে কবি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছেন। দুঃখের পরম মূল্য তিনি পেয়েছেন। 'খেয়া'র অনন্ত প্রতীক্ষা, 'গীতাঞ্জলি'র তীব্র বিরহ-বেদনা, 'গীতিমাল্যে'র যুগল-প্রেমলীলা ও মধুর বিরহানুভূতি 'গীতালি'তে পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও আত্মসমর্পণে সার্থকতা জাত করেছে—

"ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারই হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারই হউক জয়।"[১১]

এইভাবে দেখি রবীন্দ্রমানস মূলত দ্বৈততা দ্বারা প্রভাবিত। দ্বৈততা ছাড়া লীলা সম্ভব নয়। তাঁর প্রার্থনা-মূলক কবিতাগুলিতে দ্বৈতবাদীদের ভাব প্রবল। সেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ভেদ অনতিক্রমনীয়। ঈশ্বর উপাস্য, তিনি উপাসক। ঈশ্বর সেব্য এবং তিনি সেবক। কিন্তু যত তিনি মধুর রসের দিকে এগিয়েছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ভেদ ক্রমশ কমে এসেছে। তবে সেখানেও দ্বৈততা আছে। দ্বৈতবাদীদের মতো তিনিও কৃপাবাদের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঈশ্বর-কৃপা ব্যতীত সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। এমনকি তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে চান, কিন্তু নিজের অস্তিত্বের আত্মবিলোপ ঘটিয়ে নয়। মিলনের

মাঝেও তিনি তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু বজায় রাখতে চান। তবে দ্বৈতবাদীদের মতো তিনি ঈশ্বরের কোনও নির্দিষ্ট মূর্তি কল্পনা করেননি। কোনও নির্দিষ্ট সাধনাও অনুসরণ করেননি। রবীন্দ্রনাথ দ্বৈতবাদীদের মতো সালোক্য মুক্তিতেও বিশ্বাসী নন। সালোক্য মুক্তির অর্থ হল মৃত্যুর পর ঈশ্বরের লোকে গিয়ে বাস করা এবং ঈশ্বরের লীলা আস্বাদন করা। রবীন্দ্রনাথ নিজের মানস-প্রকৃতি অনুযায়ী মিলনের মাঝেও নিজের অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখতে চান, তবে দ্বৈতবাদীদের মতো তিনি বলেননি ঈশ্বর ও জীবের ভেদ অনতিক্রমনীয়। তাই রবীন্দ্রচেতনায় দ্বৈততার প্রভাব পড়লেও তা মূলত দ্বৈতভাব, মধ্বাচার্য কথিত দ্বৈতবাদ নয়।

Reference:

১. রবীন্দ্র-রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড), কবিতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, কলকাতা, সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ, ৮ মে, ২০১২, পৃ. ৪৫৯
২. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (তৃতীয় খণ্ড), কবিতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, কলকাতা, সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ, ৭ আগস্ট, ২০১২, পৃ. ৭৬০
৩. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (চতুর্থ খণ্ড), কবিতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, কলকাতা, সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ, ২৩ ডিসেম্বর, ২০১২, পৃ. ৪১৮
৪. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (তৃতীয় খণ্ড), কবিতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, কলকাতা, সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ, ৭ আগস্ট, ২০১২, পৃ. ৮৯
৫. তদেব, পৃ. ৬৫
৬. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড), কবিতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, কলকাতা, সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ, ৮ মে, ২০১২, পৃ. ৬৫১
৭. তদেব, পৃ. ৬৪৮
৮. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (তৃতীয় খণ্ড), কবিতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, কলকাতা, সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ, ৭ আগস্ট, ২০১২, পৃ. ২৬৩
৯. তদেব, পৃ. ১৮
১০. তদেব, পৃ. ৬
১১. তদেব, পৃ. ২৬৭